দৈনিক জনকণ্ঠ

50

তারিখ JAN 30 2000
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

কবিতা উৎসব বইমেলা ।। একুশের নতুন তাৎপর্যে

ফেব্রুয়ারি বাঙালীর মননে এমন এক শাশ্বত জাগ্রত চেতনার স্রষ্টা, যা কাল পেরিয়ে কালোত্তীর্ণ মর্যাদায় আজ বিশ্বজনীন। অর্ধ শতাব্দী কালের ইতিহাসের উঁচু-নিচু, মসৃণ-অমসৃণ নানা পথ পেরিয়ে একুশে বাঙালীর স্বপ্ন ও বাস্তবতার এমন এক কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে, যা এই জাতির সকল সৃজনকর্মেরও প্রেরণায় পর্যবসিত এখন। সে কারণেই দেখা যায় ভাষাশহীদদের স্মৃতি বিজড়িত এই মাসটিকে কেন্দ্র করে গত প্রায় অর্ধ শতাব্দীব্যাপী বাংলার মানুষ তাবৎ সাংস্কৃতিক উৎসব এবং স্বকীয় সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামকেও জাগ্রত রাখতে প্রয়াসী হয়েছে। জানা কথা সবারই, এই স্বকীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আসলে স্বাধীনতার নতুন আলোকিত ভুবন সৃষ্টির কৃতিত্ব অর্জন করেছে বাংলার মানুষ। সে কারণে এখনও যে কোন প্রতিবাদে, যে কোন সৃজনশীলতার কেন্দ্রে ফেব্রুয়ারিকেই স্থাপন করি আমরা। বাঙালীর সংগ্রামের গৌরবময় স্মৃতি বিজড়িত একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখটি নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ লগ্নেই সম্প্রতি পেয়ে গেল বিশ্ব মাতৃভাষা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা। সঙ্গত কারণেই ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে সমাগত হতে চলেছে নবতর অর্জনের মহিমা ও গৌরব নিয়ে। আর মাত্র ২/৩ দিন বাকি। তারপর শুরু হচ্ছে অমর একুশের মহিমায় রাঙানো ফেব্রুয়ারি। একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে এ দেশে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে ইতিহাসের নানা কালসন্ধিক্ষণে; তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি আমরা। সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে কবিতাকে হাতিয়ার করে এ দেশের কবি-সাহিত্যিকদের দ্রোহের প্রবল আত্মপ্রকাশও ঘটেছিল ভাষা শহীদদের রক্তের স্মৃতি বিজড়িত ফেব্রুয়ারিতেই। জাতীয় কবিতা পরিষদের প্লাটফর্মে গত ১৪ বছর যাবত ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাতীয় কবিতা উৎসব। এ বছরও ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি'র সড়কদ্বীপ ও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী চত্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এ উৎসব। ১৪ বছর আগে কবি শামসুর রাহমানের নেতৃত্বে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে কবিদের বিদ্রোহের যে প্লাটফর্মটি তৈরি হয়েছিল টিএসসি চত্বরে, আজ তা আমাদের সাংস্কৃতিক জাগরণ তথা কবিতা আন্দোলনের একটি শক্ত ও প্রশস্ত মঞ্চে পরিণত। সুতরাং জাতীয় কবিতা পরিষদের এ উৎসব তথা জাতীয় কবিতা উৎসবের মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতার কতটা বিকাশ ঘটেছে সেটা

নাসির আহমেদ

আজ যতটা না দ্রষ্টব্য, তার চেয়ে বড় করে দেখার বিষয় হচ্ছে—কবিতা উৎসবের মধ্য দিয়ে অর্জিত গণমুখিন সাংস্কৃতিক চেতনার সম্প্রসারণ, যা কবি এবং কবিতাকে সমাজের সচেতন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং সামাজিক-রাজনৈতিক প্রয়োজন তথা সময়ের দাবিতে সৃষ্ট এই কবিতামঞ্চ বা সাংস্কৃতিক মঞ্চের প্রয়োজনীয়তা আজকের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটেও নবতর মাত্রায় চিহ্নিত হবে– এটাই স্বাভাবিক।

সময়ের বিবর্তনে কবিতা উৎসবের লক্ষ্য এবং কর্মসূচীতে পরিবর্তন ঘটছে বার বার। যেমন পৃথিবীর ১৮৮টি দেশ একুশে ফেব্রুয়ারিকে এ বছর থেকে বিশ্বমাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করতে যাচ্ছে, এই অনন্য অর্জনকে জাতীয় কবিতা পরিষদ বরণ করছে উৎসবের মূল স্লোগান হিসাবে গ্রহণ করে এবং মাতৃভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে। এবারের স্লোগান : 'মাতৃভাষার আলোকধারায় কবিতার হোক জয়'। 'মাতৃভাষার আন্তর্জাতিকতা ও বাংলাদেশের কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধও উত্থাপিত হচ্ছে এবারের কবিতা উৎসবে। এছাড়া যে দুই প্রবাসী বাঙালীর প্রস্তাব ও প্রচেষ্টায় একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে বরণের সৌভাগ্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ, সেই ভাষাপ্রেমিক প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালামকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কবিতা উৎসবে। নিঃসন্দেহে এ উদ্যোগ তাৎপর্যবহ। এছাড়া আরও নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণের মধ্য দিয়ে এবারের জাতীয় কবিতা উৎসব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে যে অতীতের তুলনায় অধিক উজ্জ্বলতর হবে– সে ধারণা সহজেই করা যায়।

কবিতা উৎসবের প্রস্তুতি যখন সম্পন্নপ্রায়, তখন আরও একটি বড় উৎসবের আয়োজন চলছে– সেটা হচ্ছে অমর একুশের বইমেলা। বাংলা একাডেমী চত্বরে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে মাসব্যাপী যে বইমেলা, তা আজ বাঙালীর মননচর্চা তথা গ্রন্থের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক নির্মাণের সাঁকো হিসাবেই কাজ করেনি শুধু, আমাদের এক মহত্তম সাংস্কৃতিক উৎসবেও রূপান্তরিত এখন। শোকের একুশে যেমন শক্তি ও সাহসের প্রেরণা হয়ে এখন বাঙালীর কাছে উৎসবের মহিমায় দীপ্তিমান, তেমনি বইমেলা এখন নিছক মেলা নয়, এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ গত দু'বছর যাবত মেলাটিকে শুধু গ্রন্থপ্রেমীদের ও লেখক-পাঠকের নির্মল মিলনমেলায় রূপান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে। মেলাতে শুধু বইয়ের স্টল বরাদ্দের মধ্য দিয়ে অন্যান্য উটকো ঝামেলা হটানোর এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ভাষাশহীদদের আত্মত্যাগের স্মৃতিবাহী মাস ফেব্রুয়ারির এই মেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রকাশনা ক্ষেত্রে যে বিপুল জোয়ার সৃষ্টি হচ্ছে— তার সাংস্কৃতিক ফসলও আমাদের সমাজে, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজের জন্য এক ইতিবাচক প্রাপ্তি। বইমেলার সেই আয়োজন এখন সম্পন্ন হতে চলেছে। ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে মেলা শুরু হবে।

একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, কবিতা উৎসব, একুশের আসন্ন বইমেলা, কলকাতার বইমেলায় বাংলাদেশ প্যাভেলিয়ন ও বাংলাদেশ দিবস, ঢাকার বাংলা একাডেমীতে একুশে ভবন নির্মাণের সরকারী উদ্যোগ—ইত্যাদি তথ্য নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য শ্লাঘার বিষয়। এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কলকাতায় এখন চলছে ১২ দিনের বইমেলা। গতকাল শনিবার ছিল বাংলাদেশ দিবস। আমাদের সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে মোট ২০টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ঐ মেলায় অংশ নিচ্ছে। বাংলাদেশ প্যাভেলিয়ন তৈরি হয়েছে সেখানে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আদলে। বাংলাদেশের শিল্পী, স্থপতি হাশেম খান ও কবি রবিউল হুসাইনের তত্ত্বাবধানে নির্মিত প্যাভেলিয়ন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অস্তিত্বের স্মারক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ঐতিহাসিক মর্যাদা ভারতবাসীর কাছে সগৌরবে তুলে ধরল।

অমর একুশে তথা ফেব্রুয়ারি মাসটিকে ঘিরে এই যে এত সাংস্কৃতিক জাগরণ, এর ইতিবাচকতা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। কিন্তু তার পরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকেই যায়। সে প্রশ্নগুলো অপ্রিয়। কবিতা উৎসবের তাৎপর্য আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এ নিয়ে কারও দ্বিমতেরও অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। বাংলা একাডেমীতে 'একুশে ভবন' নির্মিত হবে– শতাব্দীর পর শতাব্দী বহমান হবে ভাষা আন্দোলনের মহিমান্বিত স্মৃতি– নিঃসন্দেহে আনন্দ সংবাদ। । বইমেলা দিনকে দিন আরও প্রশস্ত হবে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলার মানুষের মহিমান্বিত সংগ্রামী ইতিহাস বিকশিত হবে। এর সব কিছুই আনন্দের। কিন্তু এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে অপ্রিয় প্রশ্নটা হচ্ছে এই–, আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের এইসব অর্জনকে অর্থবহ এবং সুদূরপ্রসারীভাবে কার্যকর করার জন্য যে অবকাঠামোগত সামাজিক-সাংস্কৃতিক আয়োজন থাকা উচিত, সে বিষয়ে আদৌ কি আমরা সচেতন? মনে হয়— না। কেননা কবিতা উৎসব করছি আমরা– কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের আওতা বহির্ভূত পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে তরুণ প্রজন্মকে সাহিত্যপাঠক বা কবিতাপাঠক করে গড়ে তোলার কোন কর্মসূচী কি আছে এ দেশের পাঠ্যসূচীতে? নেই। নেই বলেই একজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, আইনজীবী কিংবা আমলা নিছক নিজের বিষয়বৃত্তে আবদ্ধ। অর্ধশিক্ষিতও বলা যাবে না অনেককেই। নিজের বিষয়ের বাইরের কোন পঠন-পাঠন নেই প্রায় অধিকাংশেরই। এক কথায় সমাজের যে পেশার দিকেই তাকাবেন— আলোকিত মানুষ খুঁজে পাবেন কি না সন্দেহ। সুতরাং এরকম সমাজ বাস্তবতায় কবিতার পাঠক, শিল্পকলার দর্শক দিন দিন হ্রাস পেয়ে এক সময়ে পেশাজীবী ডিগ্রীধারী মূর্খদের দ্বারা দেশটি ভরে যাবে। নীতি নির্ধারক ও পাঠ্যপুস্তকের প্রণেতারা হয়ত কখনও এ বিষয়টি কল্পনাও করেননি যে, একটি শিশু কিংবা কিশোরকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ করে গড়ে তুলতে হলে চাই বহুমুখী শিক্ষা তথা ব্যাপক পঠন-পাঠন। এমনকি ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিকটি পাঠ্যসূচীতে এখন প্রায় নেই বললেই চলে। আজকের এসএসসি উত্তীর্ণ কিশোর-কিশোরী জানে না বাংলার বিগত দিনের ইতিহাস, জানে না দুনিয়া তোলপাড় করা প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লবের মতো বড় ঘটনাবলী সম্পর্কেও। তারা পাঠ্যভুক্ত গল্প বা কবিতার বাইরে বাধ্য নয় একটি অতিরিক্ত গল্প-কবিতাও পড়তে। সুতরাং গোড়াতেই গলদ। দ্বিতীয়ত যে ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্যসূচী বা অসম্পূর্ণ পাঠ্য– তারও সংশ্লিষ্ট বইয়ের হদিস মেলে না সহজে। এই তো নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক জানুয়ারি শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ছেলেমেয়েদের কাছে পৌঁছাতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা জীবনের মূল্যবান সময় এভাবেই নষ্ট হচ্ছে এখন।

শুধু শিক্ষাক্ষেত্র কেন, বইয়ের কথাই ধরুন। বইমেলা হচ্ছে দেশে, হচ্ছে ভারতে। কিন্তু ভারতীয় বাজারে বাংলাদেশী বইয়ের যে বিশাল বাজার মেলে ধরার সম্ভাবনা, তা কাজে লাগাতে পারছি আমরা? পারিনি। কারণ যথার্থ উদ্যোগ নেয়া হয়নি এখনও। বইয়ের মূল্যের ক্ষেত্রেও যে বিরাট পার্থক্য পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বইয়ের; সেই পার্থক্য ঘুচানোরও উদ্যোগ নেয়া হয়নি আজ পর্যন্ত। অথচ কাগজের মূল্য কমিয়ে দেশীয় পর্যায়ে যেমন সস্তায় বই পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া যায়, তেমনি ভারতীয় বাজারেও প্রতিযোগিতা করে নিজের জায়গা করে নিতে পারে বাংলাদেশ। তার জন্য চাই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ও যথার্থ পদক্ষেপ। সাবসিডি মূল্যে কাগজ সরবরাহ করে বইয়ের মূল্য কম রাখা নিশ্চিতকরণ, সরকারী পর্যায়ে বই কেনার পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বইপত্র পড়ার বাধ্যতামূলক সিলেবাস প্রণয়ন ইত্যাকার অবকাঠামো গড়ে তোলা ছাড়া একুশের নতুন তাৎপর্যকে নতুন শতাব্দীর উপযোগী করে প্রতিষ্ঠা যে অসম্ভব, সেটা সংশ্লিষ্ট সকল মহলকেই উপলব্ধি করতে হবে।